কথা কিংবা কাহিনি

অলোক গোস্বামী

পুনশ্চ

সূচিপত্র

কথা কিংবা কাহিনি / ৯
অদৃশ্যের জন্ম / ১৬
ভুয়োদর্শন / ৩০
জালচিত্র / ৪৫
পক্ষীরাজ / ৫৮
বিদায় অভিশাপ / ৭৩
কেবলই দৃশ্যের জন্ম / ৮৩
মহাপ্লাবন / ৯৬
রোদনের ভাষা / ১০৯
নামগোত্র / ১২৪
অদ্ভুত প্রজাপতি / ১৪১
হৃদয় জোছনা / ১৫৬
শেষ প্রশ্ন / ১৬৭
চুপকথা / ১৮২
ইছামতী / ১৯৬

'প্রথম থেকেই খেলা আমাদের দখলে। অথচ কী আশ্চর্য, লড়ে যাচ্ছি কিন্তু গোল পাচ্ছি না। শেষ মুহূর্তে কেমন যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। হয় বল উড়ে যাচ্ছে বারপোস্টের অনেক বাইরে দিয়ে, নাহলে আমাদের প্লেয়ার আছাড় খাচ্ছে শুকনো মাটিতে। তবে শুকনো মাটিতে তো কেউ আর এমনি এমনি আছাড় খায় না। নিশ্চয়ই ওদের খেলোয়াররা ছুপিয়ে কোপ বসাচ্ছিল, সেটা আমাদের চোখে পড়ছিল না। কিন্তু ভগবানের বিচার বলেও তো একটা কেস থাকে। খেলা যখন প্রায় শেষের মুখে তখনই হঠাৎ রেফারির চোখে ধরা পড়ে গেল ওদের কীর্তিটা। যেহেতু ওদের বক্সের ওপরে তাই পেয়ে গেলাম পেনাল্টি। এবার আয় ব্যাটারা! আমাদের টিমে বুলু আছে, গোটা এলাকায় বিশাল পেনাল্টি ওস্তাদ। আজ অবধি একটাও মিস নেই। বল বসানো হলো পেনাল্টি এরিয়ায়। রেফারি পা মেপে মেপে দাঁড় করিয়ে দিলো ওদের প্লেয়ারদের। ঠিক তখনই বুলু কিনা বলে বসলো, কীক নেবে না। সে কী, কেন! বলল, সাহস পাচ্ছে না। সাহস জোগানোর চেষ্টা করলাম। লাভ হলো না। উল্টে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেল বুলু। আলোচনা করতে গেলাম ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। তো ক্যাপ্টন বলে কিনা আমায় কীক নিতে। কথাটা শুনে আমার ভিরমি খাবার জোগার। আমি হলাম বল বাড়ানো প্লেয়ার। ঠিক সময়ে এমন পাস বাড়াবো যে একটা অন্ধও গোল করে আসতে পারবে। অথচ তেমন পাস আমায় কেউ বাড়ালে মাথার ভেতরটা কেমন যেন ওলোট পালোট হয়ে যায়! গোলপোস্টটাই খুঁজে পাইনা। আনতাবরি শট মেরে বসি। একবার তো ফাঁকা নেট, গোলকিপারও নেই, তবু পারলাম না গোল করতে। সেবার সাপোর্টাররা আমায় ছেড়ে কথা বলেনি। মেরে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিল। দাগটা এখনও মেলায়নি। এখন ক্যাপ্টেনের কথা শুনে পুরনো দাগটা চিনচিন করে উঠলো। ভাবলাম, এবার কি মাথাটায় খোয়াতে হবে নাকি!

যতই ভয় পাই তবু আমাকেই এগুতে হলো, কেননা কেউ রাজি হল না শট নিতে। তাছাড়া আমার তো হারানোর কিছু নেই। গোল করতে পারলে ভয়টা কেটে যাবে। মিস করলেও কেউ দোষ দিতে পারবে না কারণ ওরাই আমায় জবরদস্তি পাঠিয়েছে।

বক্সে বলটা সাজিয়ে আড়চোখে গোলকিপারের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। স্কুল কম্পিটিশনে এই বুড়োটাকে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এসেছে? পরণে মস্ত আলখাল্লা। ধবধবে সাদা দাড়ি ছুঁয়ে আছে বুক। মাথা গোলপোস্ট ছাড়িয়ে উঠে গেছে আকাশ বরাবর। মাঝখানে সিঁথি করা চুল এমন ভাবে চওড়া কাঁধের ওপর লুটিয়ে আছে যেন পাহাড়ের গাঁয়ে ঝুলে থাকা মেঘ। সব থেকে অদ্ভুত গোলকিপারের চোখদুটো। আত্মবিশ্বাস মাখামাখি হয়ে আছে। এমন মায়াবি দৃষ্টিতে আমার দিকে

তাকিয়ে আছে যে মনে হচ্ছে না ওকে গোল বাঁচাতে হবে। বরং যেন আমার সঙ্গে দুদন্ড গল্পগুজব করার ইচ্ছে।

বুঝলাম, বুড়োটা আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে ভড়কি দিচ্ছে। জানেনা তো আমি কী জিনিষ। মালটাকে ঠকাতেই হবে। কিন্তু কিভাবে। আচমকা মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি এলো। মনে পড়ে গেল একটা বিজ্ঞাপনের কথা। বুড়োর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। উনিও হাসলেন। কী অদ্ভুত সেই হাসি! মুখের একটা পেশীও বাঁকল না, টোট্টাল হাসিটা উছলে এলো চোখ দিয়ে। আমায় পুরো ভিজিয়ে দিয়ে হাসিটা ছড়িয়ে গেল মাঠময়। তবু ভড়কালাম মা। সামনে ঝুঁকে জাপানি স্টাইলে অভিবাদন জানালাম। ব্যস, ফাঁদে পড়ে গেল বুড়ো। ঝুঁকে পাল্টা অভিবাদন জানাতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠল আমার ডান পা। বল নিমিষে জড়িয়ে গেল জালে।

জীবনে প্রথম পেনাল্টিতে গোল করার আনন্দে এমন লাফিয়ে উঠেছিলাম যে ঘুমটাই ভেঙে গেল। দেখা হলো না বুড়োটার এরপর কি দশা হলো। সাপোর্টাররা নিশ্চয়ই ওকে ছেড়ে কথা কয়নি!'

স্বপ্নটা শোনাতে গিয়ে এত বিভোর হয়ে পড়েছিলাম যে কোনদিকে তাকানোরই ফুরসৎ পাইনি। গল্পটা শেষ করে তাকালাম শ্রোতাদের দিকে। পরীদি মাথা নীচু করে নখ খুঁটতে ব্যস্ত। শুধু বড়াল স্যার একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার দু নম্বরীতে স্যার রাগ করেছেন ভেবে আমি অস্ফুটে বললাম, 'স্যরি স্যার। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পাইনি। সোজা পথে আমি কিছুতেই পারতাম না ওই বুড়োকে টপকে গোল করতে।'

বড়াল স্যার তেড়েফুড়ে উঠলেন, 'কীসের স্যরি! তুই যেটা করেছিস সেটা তো অঙ্ক। সিম্পল ত্রিকোণমিতি। হাইট অ্যান্ড ডিসট্যান্সের প্রবলেমটা সলভ্ করেছিস। ওই যে গোলকিপারকে ঝোঁকালি, তার মানে অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন বের করলি। ভেরি গুড। স্বপ্নটা জিওমেট্রিক্যালি ফুল কারেক্ট।'

স্যারের কথায় হাসি পেল। এই না হলে শ্রীপদ বড়াল! সব সময় মাথার ভেতর অঙ্ক কিলবিল করছে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও বাতাসে আঙুল ঘুরিয়ে অঙ্ক কষেন। কেউ যদি জানতে চায়, কি করছেন স্যার? ব্যস, তাহলে তার দফারফা। যত মাথা মোটাই হোক বড়াল স্যার লড়ে যাবেন তাকে অঙ্ক বোঝাতে। শহরে এমন গুজব চালু আছে যে প্রতিদিন সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক শিখতে বাধ্য হওয়ায় স্যারের স্ত্রী নাকি সরাসরি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

আমাদের স্কুলের টিচার হওয়া সত্ত্বেও বড়াল স্যার আমাকে চিনতেন না। চেনার কথাও নয়। কেননা স্কুলে অঙ্কে ফেল আমি একাই করতাম না এবং ক্লাসে ঢুকে ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাতেন না স্যার। তবে অন্যদের সঙ্গে আমার তফাত এটাই ছিল যে বিভিন্ন ফুটবল কম্পিটিশনে স্কুল যে প্রাইজগুলো পেত তার

অনেক ক'টার পেছনেই আমার অবদান ছিল। কিন্তু বড়াল স্যারের ফুটবল নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না।

এভাবেই দিব্যি চলছিল ক্লাস নাইন অবধি। গোলমাল বাঁধল টেনে উঠে। ইন্টার স্কুল ফুটবল ম্যাচের ফাইনালের দিন অন্য স্যাররা জোর করে বড়াল স্যারকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মাঠে। ম্যাচটায় আমাদের স্কুল তিন গোলে জিতেছিল। দুটো গোল আমার করানো।

পরদিন ক্লাসে এসেই স্যার আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোর খেলা তো নিখুঁত কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রিরে! কি নাম তোর? কত পাস অঙ্কে?'

উত্তরে শুধু মাথা চুলকেছি, কিছু বলিনি। স্যার বুঝেছিলেন, তবে ব্যঙ্গ করেননি। চিন্তিত গলায় বলেছিলেন, 'এমন তো হওয়ার কথা নয়! তোর পা অঙ্ক জানে অথচ মাথা জানে না?'

এ প্রশ্নের উত্তর যেহেতু আমার জানা ছিল না তাই চুপ করে ছিলাম। তখনই স্যার বলেছিল, 'পড়বি আমার কাছে? পয়সা দিতে হবে না।'

ওটা প্রশ্ন, নাকি আচমকা পাওয়া পেনাল্টি? আমাদের জুতোর ব্যবসা। রেললাইনের ওপারে, পুরোন কালীবাড়ি বাজারে দোকান আছে। নাম, 'পদশোভা।' কিন্তু এখন যা কিছু জৌলুষ সব রেললাইনের এপারে। ওপারের মানুষ এপারে ছোটে। সুতরাং অন্য দোকানগুলোর মতো আমাদের দোকানও তেমন চলে না। হাটের দিন কিছু লোকজন হয় বটে তবে মনের দুঃখে বাবা দোকানেই যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। দিন চলাই মুশকিল এখন আমাদের। মা চায় দোকানের দায়িত্ব নিয়ে বাবাকে রেহাই দিই। কিন্তু আমার স্বপ্ন তো ফুটবলার হওয়ার। কোলকাতার মাঠ কাঁপানোর। পড়ার অজুহাত দিয়ে কোনমতে ঠেকিয়ে রেখেছি। এখন যদি মাধ্যমিকে ফেল করি মা কোনও অজুহাত শুনবে না। ঘাড় ধরে বসিয়ে দেবে দোকানে। তারপর আমার পায়ের যাদুর কদর কেউ দেবে না। উল্টে আমাকেই জেনে যেতে হবে এই শহরে কার পা কত নম্বর।

সুতরাং পরদিনই চলে গিয়েছিলাম স্যারের বাড়ি। পরপর সাতদিন। কিন্তু সাতদিনেই স্যারের মোহভঙ্গ হয়ে গেল। বললেন, 'তোকে শেখাতে গিয়ে একটাই ভয় হচ্ছে, আমিই না শেষ পর্যন্ত অঙ্ক ভুলে যাই।'

কথাটা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে আমসি। স্যার অভয় দিয়েছিলেন, 'চিন্তা করিস না। আমার মেয়ে তোকে পড়াবে। ওর ধৈর্য আছে। তোকে ঠিক শিখিয়ে ছাড়বে।'

সত্যিই আমাকে অঙ্ক শিখিয়ে ছেড়েছিল পরীদি। মাধ্যমিকে ত্রিশ নম্বর পেয়েছিলাম, যে নম্বর আমি কোনদিন স্বপ্নেও পাইনি। পরীদি যথারীতি খুশি হয়নি। দুঃখ পাওয়া গলায় বলেছিল, 'অন্তঃ ষাট নম্বর পাওয়া উচিৎ ছিল'।

কথাটা শুনে হাসিতে পেট ফেটে গেলেও মুখে প্রকাশ করিনি। কেননা ততদিনে জেনে গেছি স্যারের মেয়ে স্যারের মতোই পাগল। কোন কথায় যে কখন রেগে উঠবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

আমাকে অঙ্ক কষতে দিয়ে পরীদি বই পড়ত। রবীন্দ্রনাথের বই। একদিন রসিকতা করে বলেছিলাম, 'ইস লোকটা কেন যে এত কঠিন লেখা লিখেছে! মুখস্ত করতে গিয়ে আমাদের জান কয়লা।'

কথাটা শুনেই রেগে উঠেছিল পরীদি। আমার খাতা বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'দুর হয়ে যা। তোর কিচ্ছু হবে না। ফুটবলারও হতে পারবি না। শিল্পীকে সম্মান না জানাতে শিখলে নিজেও শিল্পী হওয়া যায় না।'

আমি তো অবাক। একটা ইয়ার্কিতে কেউ অমন চটে ওঠে! তাছাড়া আমি তো রসিকতাটা বড়াল স্যারকে নিয়ে করিনি। করেছি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। লোকটা কে হয় পরীদির?

কথাগুলো বলার সাহস হয়নি। শান্ত শিষ্ট মেয়ের ওই রূপ দেখে ভয়ে কেটে পড়েছিলাম। কয়েকদিন ওমুখো হইনি। ভেবেছিলাম কোনদিনই যাবো না। কিন্তু নিজের গরজে সাহস জুটিয়ে হাজির হয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল পরীদির পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব। কিন্তু তার প্রয়োজন পড়েনি। উলটে পরীদিই আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল, 'তুই নোস, রবীন্দ্রনাথকে সেদিন আমিই অপমান করেছি। আমার ওভাবে রেগে ওঠা উচিৎ হয়নি। আমার রবীন্দ্রনাথ পড়াই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে।'

বড়াল স্যার পাগল সেটা সবাই জানে। স্যারের স্ত্রীরও নাকি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং পরীদিও যে পাগল হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? তাই আশ্চর্য হইনি।

একদিন পড়তে এসে দেখি পরীদি বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে কাঁদছে। যত কারণ জিজ্ঞেস করি পরীদি তত কাঁদে। বহুকষ্টে যখন জানতে পারলাম কারণটা তখন নিজেকে সামলানো আরও কষ্টকর হয়েছিল। পাগলী কাঁদছে কারণ রবী ঠাকুরের কপিরাইট না কী যেন উঠে গিয়েছে! এখন সবাই নাকি ওনাকে কাদায় টেনে নামাবে।

আমি সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, 'কিচ্ছু হবে না। দেখবে, উনি আরও উঁচু জায়গায় উঠে যাবেন। কেউ ছোঁয়ার সাহস করবে না।'

আমার কথাতেও পাগলীর কান্না থামল না। বলে কিনা, 'আমার নিজস্ব বলে যে আর কিছু রইল না রে।'

দুম করে বলে বসেছিলাম, 'কেন থাকবে না। তোমার রবীন্দ্রনাথ তোমারই থাকবে। তাছাড়া আমিও তো আছি, নাকি?'

কথাটা শুনেই এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসেছিল পরীদি।

—সত্যি বলছিস? থাকবি তুই চিরকাল আমার পাশে? আমি বড্ডো একা রে।

পরীদির গোল গোল চোখ দেখে তো আমার দফরফা। তাড়াতাড়ি হাত দুটো ধরে বলেছিলাম, 'এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

মনে মনে বলেছিলাম, 'তুমি আমায় পাচ্ছ কোথায়? মাধ্যমিকের পর তো এদিক মাড়াবোই না।'

সত্যি সত্যি আসিনি। হায়ার সেকেন্ডারিতে যেহেতু কমার্স নিয়েছি তাই এখন পরীদিকে প্রয়োজন পড়ে না। তাছাড়া খেলা নিয়েও এত ব্যস্ত থাকি যে ইদানিং আসা হয় না এ বাড়িতে। কলকাতা থেকে কয়েকজন কর্মকর্তা আসছে আমাদের শহরে, প্রতিভা খুঁজতে। আমি ডাক পেয়েছি। ট্রায়াল ম্যাচে যদি ওদের সুনজরে পড়তে পারি তাহলে কোলকাতার টিমে চান্স পেয়ে যাব। সব সময় টেনশনে থাকি। স্বপ্নেও ফুটবল হানা দেয়। এতদিন যে সব স্বপ্ন দেখেছি তারচে' গতকালেরটা ছিল বিলকুল আলাদা। তাই ভাবলাম যাই, পরীদিকে স্বপ্নের কথাটা জানিয়ে আসি। সঙ্গে ট্রায়াল ম্যাচে চান্স পাবার খবরটাও দিয়ে আসা যাবে। কেননা সারা শহর সুখবরটা জানলেও এ বাড়ির দুজন অবধারিত জানে না। এবং আমি না জানালে জানাও হবে না।

স্বপ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম। এরপর আসল খবরটা দিতাম। কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটে গেল। বড়াল স্যার উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে উঠে গেলেন অঙ্ক কষতে। পরীদিকে জানাতে গেলাম কিন্তু কোন কথা শোনার আগেই জিজ্ঞেস করলো, 'বুড়ো গোলকিপারটা রবীন্দ্রনাথ ছিল, না?'

যে আছে যার তালে। প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেললাম। ব্যস, আগুন ধরে গেল বোমার সলতেয়। চিৎকার করে উঠল পরীদি, 'বেরিয়ে যা। তোর কোনও কথা শুনতে চাই না।'

রাগে ফেটে পড়ছে পরীদি। চোখে, মুখে রক্ত উঠে এসেছে। হাসি মুখে বোঝাতে চাইলাম, 'আরে বাবা ওটা তো স্বপ্ন ছিল। সত্যি সত্যি তো আর কাউকে ঠকাইনি। ট্রায়াল ম্যাচ নিয়ে টেনশনে আছি তাই অমন স্বপ্ন দেখেছি।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। পরীদি উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। আমিও গেলাম পিছু পিছু কিন্তু আমার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, 'তুই ঠগ। তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'

এরপর আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। কোন অন্যায় ছাড়া কাঁহাতক আর অভিশাপ খেতে ভাল লাগে! দরজায় ঘুঁষি মারতে মারতে বললাম, 'দেখে নিও আমার কিছু হয় কিনা। বরং কিছু হবে না তোমার। বাড়িতে বসে শুধু পাগলামো করবে আর খবরের কাগজে আমার কথা পড়ে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে।'

॥ দুই ॥

গুরুর অভিশাপ কখনও মিথ্যে হয় না। পরীদি তো আমার গুরুই ছিল, তাই মিথ্যে হলো না। সত্যিই ফুটবলটা আমাকে দিয়ে হলো না। কলকাতায় যাবার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল। ট্রায়াল ম্যাচে আমাকে দশ মিনিটে খেলিয়েই তুলে নেওয়া